ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 09. Number 01. July 2013

গল্পের ভাষা, ভাষার অন্তর্দেশ-বর্হিদেশ

রাজিব মণ্ডল*

সারসংক্ষেপ : শওকত আলী বাংলাদেশের ছোটগল্পে একটি অনুপেক্ষ স্বর। ষাটের নিরীক্ষাপ্রিয় এই গল্পকার তাঁর গল্পে উত্তরবাংলার বিশাল জনগোষ্ঠীর লোকমুখের ভাষাকে একটি সার্বজনীন রূপ দান করেছেন। ভাষার ব্যবহারের চাতুর্যে চাবুক হাকড়ানো সমাপ্তি দিয়ে তিনি গল্পে এনেছেন নতুন মাত্রা। আলোচ্য প্রবন্ধে গল্পের ভাষার এই অর্ন্ত-বর্হিমুখকে তুলে আনার প্রয়াস দেখানো হয়েছে।

শওকত আলীর (জ.১৯৩৬) ছোটগল্পের ভাষা ও রচনাশৈলী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও তাৎপর্যপূর্ণ। ছোটগল্পের ভাষা গল্পের অন্যতম নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। কেননা ভাষা ছোটগল্পের কাঠামো ও বিষয়বস্তু থেকে পৃথক কোন বিষয় নয়। বরং ব্যক্তি ও সমাজচেতনা সমগ্রদিক থেকে লেখক তাঁর ভাষাশৈলীর আকর্ষণে পাঠককে ধরে রাখেন। 'ভাষাবোধ সাহিত্য রচনার পূর্বশর্ত। আজকাল তো ভাষা ব্যবহারের স্বেচ্ছাচারিতা রচনার শিল্পমানকে অনেক নিম্নস্তরে নামিয়ে এনেছে'।[১]

জীবনের সমগ্রতাকে স্পর্শ করতে গিয়ে শওকত আলী সমাজস্তরের নানা পেশার মানুষের ভাষাকে ছোটগল্পে অকৃত্রিমভাবে তুলে এনেছেন। ভাষা সচেতন এই কথা শিল্পী ছোটগল্পে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে রক্ত-মাংসে তুলে এনেছেন। একারণেই তাঁর ছোটগল্পের চরিত্ররা ঐতিহ্য অনুষঙ্গে গ্রথিত হয়ে আছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনশীল সমাজবাস্তবতাকে কেন্দ্র করে। কেননা সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পরপরই ভাষার প্রশ্নে বাঙালিরা ঐক্যমত পোষণের পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত হয়। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন মাতৃভাষার মর্যাদা প্রশ্নের সমান্তরালে বাঙালির মনে যে জাতীয়তাবোধের বীজ অঙ্কুরিত হয় তা অনুকূল পরিবেশে মহীরূহতে পরিণত হয়।

পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের নির্দেশ উপেক্ষা করে ১৯৬১ সালে বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম ধারক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে। একাত্তরের স্বাধীনতা বাঙালিকে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি এনে দেয়। সুদীর্ঘ দুই শতকের ব্রিটিশ শাসন ও দুই যুগের পাকিস্তানি শাসন বাংলা ভাষাকে বিলুপ্ত করতে পারে নি। বরং পাকিস্তানিদের উর্দুভাষা বাঙালির উপর চাপিয়ে দিতে চাইলে তার প্রতিবাদ আপামর বাঙালি একযোগে করে এবং আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাংলাকে বাঙালির রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়।

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০।

শওকত আলী ছাত্রজীবনেই রাজনীতির সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং এই সুবাদে উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। ঠাকুরগাঁওতে তিন বছর চাকুরি করার সময় গ্রামের মানুষজনকে ও তাদের ভাষাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার কারণেই তাঁর ছোটগল্পসহ সমগ্র সাহিত্যে উত্তরবঙ্গের বিশেষ একটি অঞ্চল তাঁর নাড়িমাটি দিনাজপুরের আঞ্চলিক ভাষার স্বভাবজ-স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার লক্ষণীয়।

শওকত আলী ভাষা ব্যবহারে সর্বদা সচেতন ছিলেন 'যখনই আমি শিল্প নির্মাণ করতে যাই তখনই আমাকে শিল্পের বাহন বা মাধ্যম হিসেবে একটা কিছুকে বেছে নিতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে ভাষাই হচ্ছে প্রধান। ভাষাটা মাধ্যমও বটে, উপকরণও বটে। বর্ণনা যতই রূঢ় হবে, যতই গালিগালাজের পর্যায়ে যাবে ততই দৈনন্দিন জীবনের ভাষা থেকে পৃথক হয়ে যাবে। সেই জন্যে প্রদোষের ভাষা আর ব্যবহারিক জীবনের ভাষা অবশ্যই আলাদা হতে বাধ্য। আমি যদি বাস ড্রাইভারের জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে চাই, তবে বাস ড্রাইভারের মুখে যদি একেবারে ভদ্রলোকের ভাষা দিয়ে দেই তবে শিল্পটা কি সঠিক হবে? আমার তো মনে হয় না। আর *প্রদোষে প্রাকৃতজন* তো সত্যিকার অর্থে কোন উপন্যাস নয়। তবুও উপন্যাস হিসেবে ট্রিট করার কারণ হচ্ছে, তার মধ্যে কাহিনী আছে, চরিত্র বিশ্লেষণ আছে, চরিত্রের বিদ্রোহ আছে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আছে। উপন্যাসের সবগুলো লক্ষণ এর মধ্যে আছে। এখন প্রশ্ন করা যায়, এর মধ্যে কি ইতিহাসই আছে? যদি তাই হয় তবে লোকে এ বই পড়বে কেন? ইতিহাসের বই পড়বে।'[২] জীবনের সমগ্রতাকে স্পর্শ করার লক্ষ্যে শওকত আলীর ছোটগল্পের চরিত্ররা তাদের পেশা, সামাজিক অবস্থান, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের আলোকে ভাষাবোধ নিয়ে উপস্থিত হয়। তাঁর গল্পের ভাষা সরল ও স্বতন্ত্র। বক্তব্য ও বাগভঙ্গিও সমন্বয় রয়েছে তাতে। প্রথম গল্পগ্রন্থ *উন্মূল বাসনা*'তেই তাঁর গদ্যনির্মাণ কৌশলের সজ্ঞানতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গল্পে বাস্তবের রূঢ়, রুক্ষ বিষয়ের সমান্তরালে বিষন্নতার ছাপও বিরল নয়। কখনো কখনো বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা আনতে উইট ও হিউমার সিদ্ধ বাক্য ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহস্ত। 'ব্যক্তির প্রতিটি কার্যক্রম, তৎপরতা, তার দোষ-গুণ, ভীতি ও সাহস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যথাযথ জীবন্ত করার জন্য গদ্যকে তিনি সেই লক্ষ্যে চালিত করেন। ব্যক্তির ক্ষয়ের কথা লেখক তাঁর একাধিক লেখায় বলেছেন। এই ব্যক্তির উপযোগী ভাষার প্রয়োজনে তিনি গল্পে ব্যবহার করেন উপভাষা। ভাষার পরতে পরতে আবার জড়িয়ে আছে শিল্পসম্মত উইট-হিউমার।'[৩]

> ক. ব্যাস, ব্যাস আর বেশি আগাইলে মাহাজনের কানত উঠিবে ই-কথা। [আর কান্দে না মা, *লেলিহান সাধ*, পৃ-১৪]
> খ. কেমন সুখ, কিসের সুখ? বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছিলো কসিমউদ্দিন। শুনে বুড়ির সে কি হাসি! হাসি আর থামতে চায় না। হতভম্ব কসিমউদ্দিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলো বুড়ি, –ভাতের সুখ, কাপড়ের সুখ, নিন্দ্-এর সুখ, নিশ্চিত হওয়ার সুখ। পারবো অমন সুখ দিবা? কসিমউদ্দিন জানতে চেয়েছে, মোর কথা কিছু কহে নি? মোর কথা তুই কহিছিলো?

> বুড়ি তখন আবার সুখের বর্ণনা করে। বলে, মণ্ডলের মাইয়া-বহুর মতন কাপড়া খালি ঝলমলাছে, খালি ঝলমলাছে বাহে, হাতত গাহানা, কানত গাহানা, মাথাত সুবাসী তেল– নুরবানু আর সেই নুরবানু নাই। [অন্ধকারের গান, শুন হে লখিন্দর, পৃ-৩২]

এই ভাষা দিনাজপুরের আঞ্চলিক ভাষা। এই ভাষার মধ্য দিয়েই আঞ্চলিকতার সাথে সাথে নির্যাতন-নিপীড়নের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। শওকত আলী আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন চরিত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে। যেমন, খাম্বা কুদরতের সরলতাকে তুলে ধরতে তার দীর্ঘকায় শরীরের সাথে কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষা চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে: এ ক্যামন মানুষ বাপু বুঝি নে, বেশ্যা মেয়েরে দেখায়ে কতিছে বিয়ে করবা? আর মেয়ে মানুষ এমন ক্যা এ্যাঁ? এই গলি থেইকে বারোয় সেও বেশ্যা– ওগলি থেকে বারোয় সেও বেশ্যা– মানুষ যাবেটা কোয়ানে? সব মেয়ের সোয়ামীরে কি জেলে পুইরে রেইখেছে নাকি, এ্যাঁ? বাবারে বাবা, এতো বেশ্যা আলো কোয়ান থেইকে– আমি বাপু বুজিনে। নিজের সঙ্গে আলাপের কথা বলে সে। সরদার সাহেব কয়ে দিলো, ছেইলেডারে তো পাবা না, ওডা মইরেছে, তা বউডারে পাতি পারো, খোঁজ করো। খুলনেতে গেরাম– পালাম না, কুষ্টে জেলা গেলাম– পালাম না। একন এখেনে কি পাবো?[৪] এছাড়া কুদরতের স্বগোতোক্তিতেও কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষাই ব্যবহার করে ব্যক্তিমানসের অর্ন্তলোকের চিত্রটিও তুলে ধরেছেন। এছাড়া ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে দেলোয়ার ড্রাইভার তার শেভির জায়গায় বসার অজুহাত সে এমনভাবে বলে যে দেলোয়ার তা অগ্রাহ্য করতে পারে না। কেননা খাম্বা কুদরতের সরলতা তার কথায়:

> কুদরত ডাইনে বাঁয়ে তাকায় এবার। ইতস্ততঃ করে খানিক। তারপর বলে, দ্যাকলাম গাছতলায় সবাই আইসে বসতিছে, তাই আমিও আলাম– তারপর বইসে রয়েছি।[৫]

'সোজা রাস্তা' গল্পে গ্রামের রাজনীতিতে সক্রিয় তিন ব্যক্তি চৌধুরী, মণ্ডল, সরকার তাদের মহাজনী ব্যবসাকে বিস্তৃত করে গ্রামের মানুষকে সহায় সম্বল ও ভূমিহীনে পরিণত করেছে। ফলে সরকার যখন রাস্তা তৈরি করার জন্য প্রশাসনের লোক গ্রামের এইসব প্রতিনিধিদের নিয়ে গ্রামে আসে তখন অনন্তদাস প্রথমে নিজের ব্যস্ততা দেখায়। কিন্তু যখন কালু মণ্ডল বলে লোকটি রিলিফের লোক, তখন সে দ্রুত নিজের চরিত্র পরিবর্তন করে এবং কাতর মিনতি জানায়, 'আইজ্ঞা আছে, হামার কতো কাম এখন–এ্যাই ব্যাটা, কালূ মণ্ডল ধমকে ওঠে আবার, বুঝে শুনে কথা কহিস, সায়েব রিলিফের লোক। অনন্তদাস যেন হাতে চাঁদ পেল। ত্বরিত হাত দুখানি জোড় করে ফেললো। বললো, হুজুর জাড়ে ইবার খুব কষ্ট গেইছে হামার, একখান কম্বল হিামাক দিবা নাগবে।'[৬] সায়েব রাস্তা বানানোর কথা বললে সে বিষয়টা বুঝতে পারে না প্রথমে। কিন্তু কালু মণ্ডল বুঝিয়ে দিলে সে মানুষের হিসেবটা বোঝে এবং মৃত-জীবিত প্রায় সবার নাম একসাথে উচ্চারণ করে ফেলে। তার সরলতায় মূর্খামি ছিল। কিন্তু তাতে কালু শেখের লাভ হয়। কেননা যে গ্রামে যত বেশি মজুর হবে সে গ্রামে তত বেশি রিফি অর্থাৎ গম আসবে। রাস্তাটি কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) এই প্রোগ্রামের

আওতাধীন ছিল। সায়েব যখন পুনরায় তার কাছে মানুষের সংখ্যাটা বলতে বলে তখন সে যা বলে তার জন্য সে খুব গর্ববোধ করে:

> আইজ্ঞা এক'শ জন ত লিচ্চয় হোবে। আইজ্ঞা এবং লিচ্চয় কথা দুটো সে কষ্ট করে শিখেছে। কথা দুটো ব্যবহার করতে পেরে মনে মনে সে খুশি হয়ে উঠেছিলো, তার ওপর আবার এতো সব কথার জবাব। হুঁহুঁ বাবা, বুদ্ধিখানা কেমন তাঁর! ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে ছোট মণ্ডলকে পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দিচ্ছে সে। আহা, একটা লোক আসে না কাছে এখন! দেখে যেতো অনন্তদান কেমন তাক-লাগানো কথা বলতে পারে। সে বারবার ডাইনে বাঁয়ে তাকায়।[৭]

সায়েব ও কালু মণ্ডল চলে গেলে দূরে যারা দাঁড়িয়ে ছিলো তারা এগিয়ে আসে এবং ব্যাপারটা কি জানতে চায়। রাস্তার কথা শুনে একেকজন একেক ধরণের কল্পনা করতে শুরু করে। কেই বলে, 'রাস্তা হবে মোটর গাড়ি চলাচলের জন্যে, কেউ বললো, শুধু রাস্তা নহে, মোর মন কহছে, টকি বাইস্কোপও এইঠে বসিবে। আরেকজন তার অনুমানের কথা জানালো। বললো, উসব কিছু নহে, আসল কথা হইল্ ফের খাজনা বাড়াবে সরকার। কিন্তুক কহিল্ যে গম দিবে? গহম না উয়ার বাপের ফলনাটা ধরে দিবে তোক, শালা গজুয়া কাঁহিকা। আর একজন সন্দেহ করে কালু শেখের উপস্থিতিতে, 'শালারা তুমরা যারা উসব কথা বিশ্বাস করিবা চাহেন, করেন, কিন্তু হামার বিশ্বাস হয় না, ঐ শালা ছোট মণ্ডল ক্যানে ছিল সঙ্গে, কহেন তুমরা?' এইসব বাক্য বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে গল্পের বুনট তৈরি হয়। গ্রামের সহজ-সরল বিশ্বাসের মানুষজন এইসব বিষয় নিয়ে কি ভাবে, তার প্রকৃত স্বরূপ বোঝাতে গল্পকার আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেন অত্যন্ত সচেতনভাবে।

'দুই গজুয়া' গল্পে পোহাতু শেখ এক অসহায় ব্যক্তি। ভাগ্নে রহিমুদ্দিনকে নিয়ে মহাজনের বাড়িতে থাকে। দুজনের পরিবার-পরিজন বলতে দুজনেই। গ্রামের সহজ-সরল দুই গজুয়া শেখকে নিয়ে মহাজন বংশানুক্রমে ক্রীতদাস করে রাখে। কিন্তু তাদেরও মনে প্রশ্ন জাগে, তাদেরও জীবনদর্শন আছে:

> মামুর মেজাজ দেখেও রহিমুদ্দিনের হাসি থামে না। সে হাসতে হাসতে বলতে থাকে, পালালো নি ক্যানে তুই, মহাজনের রাগ কেমন সেটা তো তুই জানিস মামু। মোর মতন দৌড়ে পালাইলে কি হইলো হয়? আচ্ছা বাপু তুই। একটু থেমে ফের সে উদাস স্বরে বলে, পালায় কুনঠে যাবো। মুই যে পালানু, মোক কি আর যাবা হবে নাই– মোক তো যাবাই হবে। এই এক জটিল সমস্যা পালানো যায় না। আর পালালে ফেরা যায় না। তবে পালাও বা না-পালাও মার তোমার জন্য অবধারিত।[৮]

'ডাকিনী' গল্পে দুর্ভিক্ষের কারণে ধেয়ে আসা কঙ্কালসার মানুষকে নিয়ে উপহাস মানবীয় অবক্ষয়ের নামান্তর। গল্পকার ভাষা ব্যবহারের কুশলতায় বিষয়টিকে অনেক বেশি গুরত্ববহ করে তুলেছেন: 'এই মাতারি, বাসার কাম লইবি না, তয় কি বিয়া বইবি? হো হো, বিয়া

বইবার চায়, মাতারি বিয়া বইবার চায়।[৯] এই কুট্টিদের ভাষা পুরান ঢাকার একান্ত নিজস্ব ভাষা। মহাজনের ছেলে নুকু চৌধুরী বেলালকে মৃত্যু হুমকি দেয় এই কুট্টিতেই এবং শুধুমাত্র বক্তব্যের কারণে নয় ভাষার ওজস্বীতার কারণেও বিষয়টি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে: 'কীব্বে জোর দেখাচ্ছিস মনে হয়, দুনিয়াদারির ইচ্ছা নাই নাকি?[১০]

শওকত আলী উত্তরবঙ্গের লোকজ মিথকে তুলে ধরতে আঞ্চলিক ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন 'হাঁ, ভগমানের জীব, গুপীনাথ মাথা দোলায়, কিন্তুক কুন্ ভগমানের জীব সিটা কহ? ঘামার ভগমান মা বিষহরি– হামরা সান্তাল, কালিনাগ হামার ভাই. হাঁ! বুঝে দেখিস, এই বলে সে মেঝেতে রাখা মুখ-বাঁধা থলের গায়ে একটা খোঁচা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে শব্দ হয়। থলের ভেতরকার জীবটা নড়াচড়া আরম্ভ করে দেয়। গুপীনাথ ধমকে ওঠে, চোপ সালা, তুই কুছু কহিস না, হামার সঙ্গে সদাগরের ব্যাটা লখিন্দরের হিসাব-নিকাশ– তোর কি?[১১] এই মিথের সাথে গুপীনাথের জীবনের মহাজন ও সদাগরকে যুথবদ্ধতায় প্রকাশ করে। গ্রামীণ জীবনে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ লোকজ সংস্কারের মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করে এবং এইসব লোকজ বিশ্বাস আঁকড়ে তারা বেঁচে থাকে।

'আকাল দর্শন' গল্পে আক্কাস আলী নিম্নবিত্তের প্রতিনিধিত্বকারী। ক্ষুধা নিবারণ না করতে পেরে ব্যাঙ, শামুক পুড়িয়ে খায়। গল্পটিতে শওকত আলী ভাষা দক্ষতার মধ্যে দিয়ে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন। যার ফলে আবিদ ভয় পায়। সে বুঝতে পারে উচ্চবিত্তের প্রতিনিধি হিসেবে শেষাবধি তার মত্যু ঘটবে এইসব নিম্নবিত্তের আক্রমণে: 'তমার কথার কুনো গোহা মাথা নাই-মোর বলে ভোক নাগিছে-মুই চাঁহো খাবার জিনিস, আর তমরা খালি টাকা পাইসা দেখান-টাকা পাইসা কেহ খায়, আঁ? ই কেমন পাগলা পাগলি কথা তমার-তমার কথা আর মুই না শুনোঁ-মুই নিন্দাবা যাঁও।[১২]

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী শুকদেব বুড়ো সাঁওতালী ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে: 'মাহাজন, খা-পরব দেখবো, নাচ দেখবো খাবো, নাই ক্যানে, খা। হামরা খাই, তুই খাবো নাই ক্যানে, কহ?[১৩]

'খোঁজ' গল্পে ধনা ও মনা ঢাকা শহরে এসেই কুট্টি ভাষার মুখোমুখি হয়। লোকজ বিশ্বাস ও আবেগ থেকে তারা বাসে ওঠার তাগিদে ধাবমান লোকটিকে বিচার করে 'ব্যাটার মাইয়া ঠিক পোলা বিয়াইবো, হ্যার লাইগা ব্যাটা দৌড়াইতেছে- পোলা বিয়াইন্যা মাইয়া যে চিক্কুর খান পাড়ে, হুঁহুঁ বাবা-বাপে না দৌড়াইয়া যাইবো কই।[১৪] কিন্তু একটু পরেই তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। বাসের কন্টাকটার ও ড্রাইভারের অকথ্য গালি দেয় 'আরে ও-ই মাংগির পুত, মরতে চাইলে র‍্যাল লাইনে যা, এইহানে কি, আঁ?'[১৫]। এই গালির বিরুদ্ধে তাদের সরল প্রতিবাদ একান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক 'দাদা কি কয় ব্যাটা-হালারে দিমু নাকি হোতাইয়া-হালায় মানুষ চিনে না।'[১৬] ধনা মনা দুই ভাই তাদের জাত নিয়ে অনেক বেশি সচেতন। ধামরাই রথের মেলায় গিয়ে উচ্চশ্রেণীদের সাথে খাবার খাওয়ার ইচ্ছা তাদের মনে কাজ করে। সেই মত তারা একটা খাবার

দোকানে ঢোকে এবং দই-চিড়া খেতে শুরু করে। কিন্তু ভাগ্য তাদের বাধ সাধে, কেননা তারা যে নিচু জাত এটা তাদের চেহারাতেও স্পষ্ট এবং তাদেরকে জেরা করলে তা ধরা পড়ে। পরিণতিতে তাদের বেদম প্রহার করে দোকানীসহ উৎসাহী জনতা।

'মধ্যরাতের বাণিজ্য যাত্রা' গল্পে মুন্সি নারী পাচারকারী। কিন্তু মুন্সী বলে কথা, তার আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় পুরোটাতেই তার ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট 'মুনশির বিরক্তি লাগে-কিন্তু কিছু বলতে পারে না। এক কারণ, লোকটার নোংরা কথা বলা স্বভাব, আর দ্বিতীয় কারণ, ঐ লোকের মারফতই ভিতর বাড়ির খবরটা নিতে হবে। অগত্যা মুনশি বলে, হাসি মাজাক পাছত করিস বাহে, এখুন কনে পুছে আয়, হামরা কি চলে যামো, নাকি হামাক আরও থাকিবা হোবে। দেরি হইলে বহুত দিকদারিত্ পড়ে যামো বা।[১৭] শরিফা, নুরবানরা তাদের জীবনে বারবার শুধু নিপীড়নের শিকার হয়েছে। স্বামী-সংসার, প্রতিবেশি, মহাজন, গ্রামের উঠতি যুবক সবার দ্বারা নির্যাতনের পরে তারা বাধ্য হয়ে মুনশির কথায় সায় দেয় এবং অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। নিজের গ্রাম ভিটেমাটি ছেড়ে যাবার সময় তাদের দুঃখবোধের বয়ান করে আঞ্চলিক ভাষাতেই:

> শরিফা ফের তার গল্পটা শুরু করে। বলে, এমুন কান্দাকান্দি নাগিল বাড়িত যে, ঘরের চালত কাউয়া পখি বসিবা পারে না। বুঢ়া ধুরা, জোয়ান মরদ মাগী কেহ বাদ নাই– সগায় কান্দে। কামের মানুষ চেরকেট্টুর মা কহিল, হ্যাঁ বো, তুই কান্দিস না? তোরও তো ভাতার মইছে, জলদি কান্দেক। স্যালা মুইও কান্দিবা ধরিনু। দিনভর কান্দাকান্দি- লাসের মাটি হয়ে গেইল, তা হো থামে না। রাইত হইলে কান্দাকান্দি থামিল। মুই বুঝিনু, সব বুঝিন মিটে গেল। হায় মোর কপাল। মোর দোনো সতীন মোক ঘরত ঢুকায় দুয়ার লাগায় দিলে। মুই কুছু বুঝো না– মোর কুনো দোষ হইল নাকিন। একজন পুছল, ছুঁড়ি ঠিক করে কহ, তোর প্যাটত কিছু হইছে? উমার কথা কুনো জবাব দিবা পারো না। মোর প্যাটত ফের কী হোবে? দোসরা জন ফের পুছে, ছুঁড়ি চান্দের ব্যারাম তোর কুনদিন হইতে হিসাব করে কহ। মুই ওমার কথার গোহামাথা কিছু বুঝো না। মুই স্যালা হিসাব করোঁ– দিন গিনে কহোঁ যে সমবার সমবার আট, তার নাই দুই ছয়দিন পাইলে মোর ব্যারাম ছিল। তো শুনে দুই সতীন কি খুশি। মোক কহিল, বাঁচে গেলো ছুঁড়ি- পোয়াতি হইলে তোর জান কবজ হয়ে গেল হয়। মোক কহিল, যা তোর ঘরত শুতে থাক।
>
> হায় হায় বু, মুই কি জানো যে মোর বিপদ হয় নাই। শরিফা পরের সেই অংশটি বর্ণনা করে যেখানে ঐ রাতেরই মধ্য প্রহরে এসে ঘরে ঢোকে তার বড় সতীনের এক ভাই। যে সাদা কাগজে টিপসই নেয় শরিফার, তারপর চুলের মুঠি এক হাতে ধরে অন্য হাতে খেজুর কাটা হাঁসুয়া দা খানি গলায় ঠেকিয়ে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যায় গাঁয়ের সীমানায়। তারপর বলে দেয়, সে যেন আর কখনো গাঁয়ে না ঢোকে। শরিফা ঐ অংশটি সহজেই বর্ণনা করে। তারপর সে থামে– দম নেয় যেন– ফের থামে– শেষে বলে, বু মুই বুঝোঁ নাই ঐসম. বুঢ়াটার এ পয়দা– কিন্তুক মুই বাঁচায় থুবা পারোঁ নাই– ছুয়াটা মোর মরে গেইছে বু, বুকত দুধ আইসে না, প্যাটত ভোক, ক্যান্নে বাঁচে ছুয়া কহ?[১৮]

'দিনগুজরান' গল্পে আটকে পড়া পাকিস্তানি ক্যাম্পের সিমরন বিবি, মুশতারি, ছোটা ও বড়া লালু, লায়লা, বুড়ো বেলালসহ সকলে উর্দুতেই কথা বলে। কেননা উর্দু তাদের মাতৃভাষা। একাত্তরে পরাজিত হয়ে এইসব পাকিস্তানিদের দায়ভার নেয় নি। বাংলাদেশ সরকার তাদের পুর্নবাসন করলেও তারা নিজেদেরকে এখনো পাকিস্তানি ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং একারণে তারা সুযোগ খোঁজে পাকিস্তানে তারা কিভাবে যেতে পারবে। কিন্তু সহায় সম্বলহীন এইসব মানুষের কথা কেউ কখনো ভাবে না। খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত এইসব মানুষের দায়ভার কখনোই কোন সরকার নেয় না। কথাশিল্পী শওকত আলী এইসব মানুষের দুঃখগাথাকে তুলে এনেছেন। তাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান ও ভাষাকে তুলে ধরেছেন সহজাত প্রতিভায়:

ক. ছোট লালুর মুখে তো আজকাল সর্বক্ষণ ওই কথা, হামলোগ এঁহি তাবাহ্ হো যায়েঙ্গে। দাদাজান বহোত বড়া গলতি কিয়া, আব্বুজানভি গলতি কিয়া, ইসি লিয়ে জানভি দেনা পড়া, আগার এঁহা সে ভাগ যাতা, তো বাঁচ যাতা। [দিনগুজরান, *দিনগুজরান*, পৃ-১০]

খ. তো গেল একদিন মুমতাজকা বড়া লেড়কা মনসুর। পরে জানা গেল, ছোড়া একা যায়নি। সঙ্গে নিয়ে গেছে বেলাইয়া বুড়োর বড় নাতনিটিকে। বেলাইয়া বুড়োর বড় জামাই ছিল মিলিটারিদের সঙ্গে– ওদের সঙ্গে সেও হিন্দুস্তানি ফৌজের কাছে ধরা দেয়। যাবার সময় বউ আর শ্বশুরকে বলে যায়, ফিকর মাত করনা-হামলোগ জলদিহি তুমলোগকোভি লে যায়েঙ্গে। কিন্তু ওই বলা পর্যন্তই। আকমলের আর কোনো খবর পাওয়া যায় নি। একখানা চিঠি পর্যন্ত না। [দিনগুজরান, *দিনগুজরান*, পৃ-১২]

গ. আরে ইজ্জত তো হোতা হ্যায় ইনসানকো। হামলোগ থোড়াই ইনসান হ্যায় যো ইজ্জতকো বাচানেকে লিয়ে ভাগতি রহোগি? মেরা বাত সুনলে বেটি, ইজ্জতকা খেয়াল দিমাগসে নিকাল কার রাস্তেমে ফেক দে। [দিনগুজরান, *দিনগুজরান*, পৃ-১২]

ঘ. আরে বেটা হামার দোনো লালু কাঁহা গইল পাতা নেহি, রাত হো গইল একো লালু ঘর না আইল– তেরা কুছ মালুম হ্যায়।
না দাদি, শামু উপুড় হয়ে শোয়। তারপর বলে, আজ তো হামার সাথ মুলাকাতই না ভৈল। [দিনগুজরান, *দিনগুজরান*, পৃ-১০]

ঙ. নেহি বিটিয়া, সিমরন বিবি মাথা নাড়ায়। বলে, দো মুঠি চাওল থাইলহন দোপহর কো, রোটি রহ গয়ি, খা না সাকি– কৈসে খাঁউ। দিলমে চৈন কাঁহা? রাতকো নিন্দ না আয়ে। একেলি বৈঠ বৈঠ রহ কর কেত্তা দৈন বিতাউ তুহি বাতা? [দিনগুজরান, *দিনগুজরান*, পৃ-১৫]

চ. ছোটা লালু লায়লা আর মনসুরের কথা তোলে। বলে, মনসুর বালবাল বাঁচ গিয়া– আগর বর্ডারমে পকড়া যাতা তো ওহি কেসসা থম হো যাতা। ভাইয়া, তুমনে ঠিক কাহা, বর্ডারকা কারোবার বহুৎ খাতারনাক হোতা হ্যায়– যো জি চাহে করো বেটা। মুশতারি বিছানায় পাশ ফিরতে ফিরতে বলে, মাগর গায়ের কানুনি কুছভিনা করনা–

লেকিন কেয়া করু মা, হামলোগকো ইঁয়ে কোই জিন্দেগি হ্যায়? বোলো? ইঁহা রাহনেসে কেয়া ফায়দা মা, ইঁহা রাহনা আউর ঘুটঘুট কারকে মারনা একহি তো বাত– ইসি লিয়ে তো কাহতা হু, চলো, হামলোগ ইঁহাসে ভাগ নিকলে।

ইা বেটা, মুশতারি ছেলেকে বোঝায়। বলে, জলদি কুছভি না কর না, দিমাগ ঠাণ্ডা রাখো– দেখো আল্লাহ কারে– হামে তো যানাহি পড়েগা– হাম যায়েঙ্গেভি, লেকিন সোচ সামাঝ করকে। [দিনগুজরান, *দিনগুজরান*, পৃ-১৬]

'এক কাহিনী' গল্পে সৈয়দা তাহমিনা বানু ও মির্জা মারজুক হোসেনকে অভিজাত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করতে তাদের কণ্ঠে উর্দু ও হিন্দি ভাষার ব্যবহার যথোপযুক্ত হয়েছে। পাখিটি যখন খাঁচা ভেঙ্গে পালিয়ে যায় তখন পাখিটিকে খাঁচা বন্দী করার জন্য আবেগের আতিশয্যে তাকে হিন্দিতে ডাকে সৈয়দা তাহমিনা বানু 'আ মেরি রুনিয়া, চলি আ মেরি দির। ও মেরি জিগরকে টুকরে– দুহাই তু আ যা'[১৯] এছাড়া শায়েরী বৈঠকে মির্জা মারজুক হোসেন ও সৈয়দা তাহমিনা বানু রূবাইকে আশ্রয় করে আসর জমিয়ে তোলে। দুজনের উপস্থিতিতে পরিবেশকে আবেগঘন করতে মির্জা মারজুক ইচ্ছে করেই রূবাই-এর শের আওড়ায়:

জো পুছতা হ্যায় কোই সুর্খ কিউ হ্যায় আঁখে
তো আঁখ মলকে ম্যায় কহত হু রাত সো না সকা
হাজার চাঁহু মগর য়ে না কহ সকুঙগা কভী
কি রাত রোনে কি খাহিশ থী আউর রো না সকা।[২০]

এর পেছনে মারজুকের প্রচ্ছন্ন প্রণয়ভাবনা কাজ করে। কেননা দীর্ঘদিনের একাকীত্ব ঘোচাতেই সে তাহমিনা বানুর শায়েরি আসরে আসে এবং তার বিশ্বাস ছিল তাহমিনা বানু তার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হবে। কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি। কেননা তাহমিনা বানু তার স্বামীর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং এবিষয়টি মির্জা মারজুককে জানায় মির্জা গালিবের শের বলেই:

ইশ্ক পর জোর নেহি হ্যায়
ইয়েও আতিশ গালিব
কি রাগায়ে না রাগে
ঔর বুঝায়ে না বুঝে।[২১]

'পুরষ্কার' গল্পে কর্পোরেট ভাষা হিসেবে শওকত আলী ইংরেজিকেই ব্যবহার করেছেন।

ক. ইট্স ম্যাটার অব মিনিটস্ স্যার।
খ. পাপদের অর্গানাইজেশনের চিফ প্যাট্রন?

এছাড়া হিথ্রো বিমানবন্দরে নাগরিক সৌজন্যতাবোধে ভাগ্নের সাথেও মামাকে ইংরেজি বাক্য বিনিময় করতে হয়।

ক. লুক দ্য সানসেট অফ ইউকে, দ্য সান অলসো গিভিং ইউ ফেয়ারওয়েল।
খ. ডোন্ট ওরি, ইটস ওকে ফর মি।

শওকত আলী উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক শব্দের পাশাপাশি আরবি-ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি-উর্দু ব্যবহার করেছেন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে। বাঙালি ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যনির্ভর প্রকৃতি বর্ণনার সমান্তরালে দেশীয় শব্দের বিপুল ব্যবহার গদ্যকে ঋদ্ধ করেছে যেমন,

ইংরেজি শব্দ : ম্যাটার, মিনিস্টার, স্যার, চেয়ারম্যান, ইনভাইটেড, প্যাট্রন, ননসেন্স, চিফ, ওরগানাইজেশন, পাপা, কার, গ্রে, রেপ, আফিম, রেশন, বর্ডার, প্রাইজ, সেরিমনি, ক্রেস্ট, এয়ারপোর্ট, রিপোর্টার, পার্কিং, সানসেট, ফেয়ারওয়েল, এক্সপেক্ট, রিটার্নস, স্যুটকেস, কফি, ক্রেজি, আওয়ারস, কোম্পানী, ট্রাভেল, চেক, ইনজিনিয়ারিং, কাস্টমস, সিকিউরিটি, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, ইউনিভার্সিটি, আটলান্টিক, প্যাসিফিক, চেকিং, এমবার্কিং, রেজিস্টার, ল্যাভেন্ডিস, গার্জিয়ান, ইন্টার্নশিপ, ফোনেটিকস, ফিলোলজি, ফর্মালিটিজ, কম্পাউন্ডার, ম্যাক্সি, ইন্টারমিডিয়েট, প্রাইভেট, ব্লাড প্রেশার, ডায়লিসিস, প্রোটিন, ডায়েট, ভিটামিন, বি নেগেটিভ, ক্রিয়োটিন, নেফ্রোলজি, ফিভার, ইউরোলজিস্ট, টেলিফোন, ক্রসম্যাচিং, সার্টিফিকেট, ওপারেশন, এফিডেভিট, সিনিয়র, ডিপার্টমেন্ট, কার্পেট, পাসপোর্ট, ভিসা, হাসব্যান্ড, রিস্কি, ফ্রেন্ড, কমরেড, রাইফেল, ট্রেনিং, এ্যারিস্টোক্র্যাট, পলিটিকস, সিটিজেনশীপ, জয়েন্ট সেক্রেটারি, সেন্ট্রাল, একসেন্ট, মার্কেট, রিপোর্টিং, ইউক্যালিপ্টাস, প্লাটফর্ম প্রভৃতি।

হিন্দি ও উর্দু শব্দ : হাম, তুহার, আইলকা, পোতা, ভাচালে, ফিকর, তাবাহ্, বাক, গলতি, যায়েঙ্গে, জানভি, মওকা, তুমলোগ, শরমকি, মাতকারনা, মারগেয়ি, বিমারি, জরুরথি, বিটিয়া, বিন্দিয়া, শর্মিলী, থোড়াই, ইনসান, ইজ্জত, , ফেক, নামমুমকিন, মুলাকাত, ভেজ, দোপহর, দিমাগ, নিন্দ, নিকাল, পাকড়া, খাতারনাক, লেকিন, দিল, জিগারকে টুকরে, খাহিশ, রোনে, গুলাস্তা, পাস্তর, জোরসে, তওবা প্রভৃতি।

ব্যবহৃত গাছের নাম : মান্দার, অর্জন, ডেপয়ারা, আমড়া, আমলকি, বট, পাকুর, কাঁঠাল, আম, শিমুল, শেওড়া, বকুল, শাল, কদম, তাল, কৃষ্ণচূড়া, খেজুর, জলপাই, কলা, কামরাঙ্গা, সফেদা।

মাছের নাম : শুটকি মাছ, রুই, কাতলা, মৃগেল, পুঁটি, ট্যাংরা, মৌরলা, বিন্ন, শিং, কৈ, মাগুর, সাটি, বাইলা, পুঁয়া, বাইন, গচি, বোয়াল, ইলিশ, ডারকা, চ্যাং, টেপা প্রভৃতি।

বিভিন্ন পেশার মানুষ : মুদি দোকানদার, ড্রাইভার, হেলপার, ঝাড়ুদার, কামার, মুটে, সার্কাসের ম্যানেজার, নর্তকী, গোয়ালা, মহাজন, কলু, চোর, ভাসমান, পতিতা, পতিতার দালাল, পানের দোকানদার, হোটেলের বেয়ারা, ফরেস্ট অফিসার, গৃহশিক্ষক, ব্যাংকার, সাংবাদিক, স্টেশন মাস্টার, ফ্রিল্যান্স দুর্ভিক্ষ গবেষক, দর্জি, মেথর, ডোম, পিয়ন, কেরানি, ঠিকাদার, নারী পাচারকারী, ঋণখেলাপী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, নার্স, আর্মিও ক্যাপ্টেন, উর্দুর প্রফেসর, উকিল, হেকিম, মৌলভী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ইপিআর জওয়ান, যুগ্ম সচিব, ছাত্রনেতা, মন্ত্রী, মুক্তিযোদ্ধা।

কৃষকের পেশা ও জীবনাচার সমৃদ্ধ বাঙালি ঐতিহ্যনির্ভর নানা শব্দ : দলারদরগা, কান্দর-মাটি, নিন্দালু, গজুয়া, উটকানো, খুঁই, খিয়ারমাটি, ঝাঁটা, পোড়ামরিচ, সানকি, জমি-জিরাত, কাঁথা, বদনা, বেড়া, খুঁটি, ভিটেমাটি, ঢিবি, নয়ানজলি, চোতের বাতাস, তুফান, তহবিল, কান্দর, গোবর, ধনচের চাল, কোদাল, নিড়ানি, মাথাল, ধানের আঁটি, দহলিজ, খোলান, জলচৌকি, তামুক, হুকা, খোরাকি, আপখোরাকি, বেটাবেটি, বালিশ, পান-সুপরি, খেত মজুর, চুন, কড়কড়া ভাত, চিতইপিঠা, পাটের

ব্যাগ, কলার মোচা, ঢেকি শাক, বতুয়া শাক, হেচি শাক, হাচ্কা দর, বিন্নির খই, পায়েস, খিরাই, দলান প্রভৃতি।

লৌকিক আমেজ মিশ্রিত শব্দ : নিশিদিন খাঁ খাঁ করে, দুনিয়া আসমান, চৈত্রমাসের শূন্যতা, ভাদরের গরম, হা হা করা শূন্যতা, নিজের শীর্ণ হাত, আঙ্গুলের খটখটে গেরো, শক্ত হাটু, পায়ের চিকন পাতা, প্রখর চৈত্রের শুকনো বাতাস, থম ধরা কান্দর, চোখের মনির ধূসর কালো বিন্দু, ছপছপ বৃষ্টি, আজলা জল, হুকায় গুড়ুক গুড়ুক টান, পটপট আওয়াজ, শরীর শির শির করা, ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া প্রভৃতি।

শওকত আলীর গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিষয় অনুযায়ী ভাষা ও প্রকাশরীতির সমীক্ষা। তাঁর গল্পে বর্হিবাস্তবের সঙ্গে সমান মর্যাদা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে অর্ন্তবাস্তবতাও। তাই তাঁর গল্পে এসেছে ইতিবাচক দু'দিকেরই বহুমাত্রিক নিরীক্ষা। এছাড়া গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের দ্বিবিধ-প্রসঙ্গকে মূর্ত করতে গিয়েই তাঁর ভাষা হয়েছে অলংকারবহুল, প্রাঞ্জল ও চাতুর্যপূর্ণ। তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের জীবনঘনিষ্ট বাস্তবতাকে তিনি তুলে ধরেছেন কুশলী বর্ণনায়:

> ক. শালা পা চাটা কুত্তা। নফরের ব্যাটা নফর। ঐ শালারই যেন উৎসাহটা বেশি। অন্ততঃ তখন তা-ই মনে হয়েছিল। আর তাতেই কিসমত মিয়ার ঘাড় হঠাৎ বেঁকে যায় ঐ কথা শুনে। বাপের কথা মনে পড়ে,মরে যাওয়া বউয়ের কথা মনে পড়ে। তারপর সে উঠে আসে চুপচাপ মহাজনের সামনে থেকে। [অচেনা, *শুন' হে লখিন্দর*, পৃ-৯]
>
> খ. কাহাকো মোর বিশ্বাস নাই। চোর আসে গোলাত্তে ধান লিয়ে চলে গেল্। কুনো শালা দেখ্ নাই– ই হবা পারে?.. ..দুজনের মধ্যে ফের চোখাচোখি হয় এবং এবার তারা দু'জনেই একসঙ্গে মুখ খোলে। বলে, না মহাজন, মানুষটাক হামরা চিনিবা পারি নাই, কেমন আন্ধার ঐ স'ম –আন্ধারত্ কি মানুষ চিনা যায়?- [অচেনা, *শুন' হে লখিন্দর*, পৃ-১৩]
>
> গ. সে হাসতে হাসতে বলতে থাকে, পালালো নি ক্যানে তুই, মহাজনের রাগ কেমন সেটা তো তুই জানিস মামু। মোর মতন দৌড়ে পালাইলে কি হইলো হয়? আচ্ছা বাপু তুই। একটু থেমে ফের সে উদাস স্বরে বলে, পালায় কুনঠে যাবো। মুই যে পালানু, মোক কি আর যাবা হবে নাই– মোক তো যাবাই হবে। এই এক জটিল সমস্যা পালানো যায় না। আর পালালে ফেরা যায় না। তবে পালাও বা না-পালাও মার তোমার জন্য অবধারিত। [দুই গজুয়া, *শুন' হে লখিন্দর*, পৃ-৬০]
>
> ঘ. 'এই মাতারি, বাসার কাম লইবি না, তয় কি বিয়া বইবি? হো হো, বিয়া বইবার চায়, মাতারি বিয়া বইবার চায়। [ডাকিনী, *শুন' হে লখিন্দর*, পৃ-৬৬]
>
> ঙ. দেইখা যা লো কেমুন চান্দের হাট বহাইয়া থুইছি। তর মতোন কপাল কি আমাগো, ভানু হাসে। বলে, মনে হয় রেশন দোকানে লাইন দিছে! একটা তো তর পীরিতের ভাতার– বাকি দুইটা কে? ক্যান পুরুষ মানুষ– লাং কস, ভাতার কস– সবতো মাইয়া মানুষের গাহাক– গাহাক না, ক'তুই?
>
> হ'লো, হ্যারা গাহাক আর আমরা হইলাম মাল।
>
> খালি মাল না লো, দোকানীও। [কুদরতের গল্প, *শুন' হে লখিন্দর*, পৃ-৪৩-৪৪]

চ. এই কোনা চ্যাট খাইলে কি প্যাট ভরে? তমরা মোক আরো কুছু দ্যাও। [আকাল দর্শন, *বাবা আপনে যান*, পৃ-২২]

ছ. আমাগো ম্যানেজার থাকলে তো কমু, বিদেশ গেছে, না মরছে কুত্তার বাচ্চা-তিনমাস আমরা বেতন পাই না।

বেতন না পাইলে খাও কি?

এই কথায় হেসে ওঠে মালতীরাণী। বলে, বাতাস খাই, বাতাস খাইয়াই বাঁইচা রইছি। [প্রথম বাস, *বাবা আপনে যান*, পৃ-২২]

জ. মেয়ে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করে দু'মুহূর্ত। তারপর বলে, বাবা আপনে যান অহন, আমি কামে যামু। হাসমত মোল্লার বিভ্রান্তি আরো বাড়ে, এতো রাতে মেয়ের কোন কাজ? কেমন কাজ? তাহলে শুকুর আলীর কথাই কি ঠিক? সে জিজ্ঞেস না করে পারে না। বলে, এতো রাইতে কিয়ের কাম তর? এ্যাঁ? আমি তো বুজি না। [বাবা আপনে যান, *বাবা আপনে যান*, পৃ-২২]

ঝ. তেভাগার সময় পুলিশের গুলি লেগেছিল পায়ে। দেখা হলেই বলতো, মাহাজন নাঢ়াইটা হোবে নাই? কহিবা পারিস, কুন দিন হোবে নাঢ়াইটা? [বনগমন, *বাবা আপনে যান*, পৃ-৫০]

ঞ. ব্যাটার মাইয়া ঠিক পোলা বিয়াইবো, হ্যার লাইগা ব্যাটা দৌড়াইতেছে- পোলা বিয়াইন্যা মাইয়া যে চিক্কুর খান পাড়ে, হুঁহুঁ বাবা-বাপে না দৌড়াইয়া যাইবো কই।

'আরে ও-ই মাংগির পুত, মরতে চাইলে র‍্যাল লাইনে যা, এইহানে কি, আঁ?

'দাদা কি কয় ব্যাটা-হালারে দিমু নাকি হোতাইয়া-হালায় মানুষ চিনে না। [খোঁজ, *বাবা আপনে যান*, পৃ-৬১]

ট. অবস্থা বেগতিক দেখে চৌধুরী সরকার মণ্ডল মুনশিকে একত্র হতে হয়। একত্র হয়ে এক দরখাস্তে নাম দস্তখত করে জেলা শহর পর্যন্ত ছোটাছুটি করতে হয়। নতুন করে শলাপরামর্শ হয় কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে। সে অনেক কাণ্ড–ওসব সবাইকে জানানোর দরকার নেই। গাঁয়ে একটা পাকা রাস্তা হচ্ছে এ কি কম কথা? বলো? ভেতরে কি-হয়েছে না-হয়েছে সে খোঁজ করে তোমার কি লাভ? [সোজা রাস্তা, *শুন' হে লখিন্দর*, পৃ-১৮]

'ছোটগল্প সাহিত্যের সবচেয়ে অবার্চীন শাখা। যান্ত্রিক যুগে শিল্পচর্চার সুবিধার্থে ব্যক্তি-জীবনের অনবসর ও ব্যস্ততা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ছোটগল্প। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রত্যেকটিতেই জীবনের চিত্র রূপায়িত হয় এবং প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক শৈল্পিক কাঠামোতে নির্মিত। শুধু খণ্ডকালীন জীবনের অভিব্যক্তি নিয়েই ছোটগল্প হয় না। খণ্ড ঘটনাংশকে সমগ্রজীবনের ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করার মধ্যেই ছোটগল্পের সার্থকতা।'[২২] শওকত আলীর ছোটগল্পে এই বৈশিষ্ট্যটি প্রবলভাবে প্রকটমান। তাঁর গল্পে জীবনের সমগ্রতাকে স্পর্শ করার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর মতামত, 'আমার সমগ্র সাহিত্যে মধ্যবিত্তের জীবন যেমন আছে, তৃণমূলের জীবনও আছে, জীবন ও সমাজ বাস্তবতা উঠে এসেছে। মনস্তাত্ত্বিক

ব্যাপার কোন ক্ষেত্রেই প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে নি, তবে এর উপস্থিতি পাওয়া যায় অর্থাৎ জীবনের সামগ্রিকতাকে ধরার একটা চেষ্টা আমার লেখার মধ্যে আছে'[২৩]

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ অর্ন্তগঠনের চেতনাপ্রবাহ বহুভুক্ত হতে বাধ্য; উপরোক্ত উক্তিগুলোর মধ্যে শ্রেণীবিভক্ত মানুষের অস্তিত্ব ও তাদের ভাষাবোধের সুস্পষ্টতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া রাষ্ট্রীয় চিন্তা, ধর্মবোধ, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন, নীতিবোধ প্রভৃতি ধ্যান-ধারণার সমন্বয়ে যে শ্রেণীর ভাষাবোধ তৈরি হয় শওকত আলীর ছোটগল্পের ভাষা সে চেতনাধর্মী।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. চিহ্ন, সাক্ষাৎকার (গল্প-আড্ডা-নস্টালজিয়ায় শওকত আলী: আলাপনে কিছুক্ষণ), সম্পাদক শহীদ ইকবাল, রাজশাহী, একুশে বইমেলা ২০০৯, পৃ-১০৪।

২. নিসর্গ, শওকত আলী সংখ্যা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ সরকার আশরাফ, সম্পাদক সরকার আশরাফ, বগুড়া, মার্চ ১৯৯২, পৃ-২৮।

৩. মার্ক্সবাদ ও সাহিত্য, তানভীর মোকাম্মেল, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল মার্চ ১৯৮৯, পৃ-২০।

৪. কুদরতের গল্প, শুন হে লখিন্দর, শওকত আলী, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১১৪, রেডক্রিসেন্ট বিল্ডিং, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃ-৪৪।

৫. কুদরতের গল্প, শুন হে লখিন্দর, , *প্রাগুক্ত*, পৃ-৩৯।

৬. দুই গজুয়া, শুন হে লখিন্দর, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৬০।

৭. সোজা রাস্তা, শুন হে লখিন্দর, *প্রাগুক্ত*, পৃ-২০।

৮. সোজা রাস্তা, শুন হে লখিন্দর, *প্রাগুক্ত*, পৃ-২০।

৯. ডাকিনী, শুন হে লখিন্দর, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৬৬।

১০. অপেক্ষা, শুন হে লখিন্দর, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৭৬।

১১. শুন হে লখিন্দর, শুন হে লখিন্দর, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১২০।

১২. আকাল দর্শন, বাবা আপনে যান, শওকত আলী, প্রাকৃতজন, আজিজ কো-অপারেটিভ সুপার মার্কেট, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ-১৯।

১৩. বনগমন, বাবা আপনে যান, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৫৭।

১৪. খোঁজ, বাবা আপনে যান, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৬১।

১৫. খোঁজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৬১।

১৬. খোঁজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৬১।

১৭. মধ্যরাতের বাণিজ্য যাত্রা, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৮৩।

১৮. মধ্যরাতের বাণিজ্য যাত্রা, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৯৩-৯৪।

১৯. এক কাহিনী, দিনগুজরান, শ্রাবণ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ-২৭।

২০. এক কাহিনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৯।

২১. এক কাহিনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৩৪।

২২. আধুনিক সাহিত্য পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিকৃতি, অনীক মাহমুদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৭, পৃ-১১।

২৩. *চিহ্ন*, সাক্ষাৎকার (গল্প-আড্ডা-নস্টালজিয়ায় শওকত আলী: আলাপনে কিছুক্ষণ), সম্পাদক শহীদ ইকবাল, রাজশাহী, একুশে বইমেলা ২০০৯, পৃ-১০৬।